4033 - আশুরা দিবস উদযাপন কিংবা আশুরার মাতম করার বিধান কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আশুরা উপলক্ষে মানুষ চোখে সুরমা দেয়, গোসল করে, মেহেদি লাগায়, মুসাফাহা করে, দানাদার খাদ্য রান্না করে, খুশি প্রকাশ করে ইত্যাদি করার বিধান কি? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কি কোন সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে; নাকি হয়নি? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কি বিদআত নয়? আবার অপর গোষ্ঠী যা করে থাকে- মাতম, দুঃখ প্রকাশ, তৃষ্ণার্ত থাকা, চিৎকার-কান্নাকাটি করা, বুকের কাপড় খুলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা– এগুলোর কি কোন ভিত্তি আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখুল ইসলামকে এই প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন: সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিংবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে কোন সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়নি। মুসলিম ইমামদের কেউ, কিংবা চার ইমামের কেউ কিংবা অন্য কোন আলেম এসব কাজকে মুস্তাহাব বলেননি। বর্ণনা নির্ভর গ্রন্থগুলোতে এ ব্যাপারে কিছু নেই; না আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে; না তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে, না তাবেয়ীগণ থেকে; না আছে সহিহ কোন রেওয়ায়তে; না আছে দুর্বল কোন বর্ণনা। না আছে সহিহ কোন হাদিস গ্রন্থে; না আছে সুনান শ্রেণীর গ্রন্থগুলোতে; না আছে মুসনাদ শ্রেণীর গ্রন্থগুলোতে; উত্তম প্রজন্মগুলো থেকে এ সংক্রান্ত কোন হাদিস জানা যায় না। তবে, পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন- যে ব্যক্তি আশুরার দিন সুরমা লাগাবে সে ব্যক্তি ঐ বছর চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হবে না। যে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করবে সে ব্যক্তি ঐ বছর আর অসুস্থ হবে না। এ ধরনের আরও অনেক হাদিস। আশুরার দিন নামায পড়ার অনেক ফজিলতও তারা বর্ণনা করেছেন। তারা বর্ণনা করেছেন যে, এই দিন আদম (আঃ) তওবা করেছেন; এই দিন নূহ (আঃ) এর কিস্তি জুদি পর্বতে নঙ্গর করেছে; এদিন ইউসুফ (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) এর কাছে ফিরে এসেছেন; এই দিন ইব্রাহিম (আঃ) কে আগুন থেকে মুক্ত করা হয়েছে; এই দিন ইসমাইল (আঃ) এর বদলে বকরী জবাই করা হয়েছে ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে একটি বানোয়াট হাদিস তারা বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি এ আশুরার দিন তাঁর (নবীর) পরিবারের কারো সচ্ছলতা এনে দিবে আল্লাহ সারা বছর তাকে সচ্ছল রাখবেন।

এরপর শাইখুল ইসলাম ইরাকের কুফাতে বসবাসরত দুইটি পথভ্রষ্ট দল সম্পর্কে আলোচনা করেন; যারা আশুরার দিবসকে তাদের বিদআত বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসব হিসেবে গ্রহণ করত। এ দুই দলের একদল হচ্ছে-রাফেজি; যারা আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত দেখায়; আর ভিতরে ভিতরে তারা হয়তো ধর্মত্যাগী মুরতাদ, নয়তো কুপ্রবৃত্তির অনুসারী জাহেল। আর অপর দল হচ্ছে-নাসেবি; যারা ফিতনার সময় যে যুদ্ধ হয়েছে সে কারণে আলী (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সহিহ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “সাকিফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী জন্মাবে।” মিথ্যাবাদী লোকটি হচ্ছে- মুখতার বিন আবু উবাইদ আল-সাকাফি। সে আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত এবং নিজেকে তাদের পক্ষের লোক হিসেবে প্রচার করত। সে ইরাকের গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে হত্যা করে। যে উবাইদুল্লাহ হুসাইন বিন আলী (রাঃ) কে হত্যাকারী সৈন্যদল প্রেরণ করেছিল। পরবর্তীতে এ মুখতার তার মিথ্যা মুখোশ উন্মোচন করে এবং নবুয়ত দাবী করে; বলে যে তার উপর জিব্রাইল ফেরেশতা নাযিল হয়। এক পর্যায়ে যখন ইবনে উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে তার ব্যাপারে জানানো হল। তাদের কোন একজনকে যখন বলা হল: মুখতার বিন আবু উবাইদ দাবী করছে যে, তার উপর জিব্রাইল নাযিল হয়। তখন তিনি বললেন: সে সত্যই বলছে; আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি কি তোমাদেরকে জানাব কাদের উপর শয়তানেরা নাযিল হয়? তারা নাযিল হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপীর উপর। অন্যজনকে যখন বলা হল: মুখতার দাবী করছে যে, তার উপর ওহি নাযিল হয়। তিনি বললেন: সে সত্যই বলছে -“নিশ্চয় শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের প্রতি ওহি (প্রত্যাদেশ) নাযিল করে যাতে তারা তোমাদের সাথে তর্ক করতে পারে।”।[সূরা আনআম, আয়াত: ১২১] আর ধ্বংসকারী হচ্ছে- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফি। সে ছিল আলী (রাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধী। তাই সে ছিল নাসেবি তথা আহলে বাইতের বিদ্বেষী। আর প্রথমজন ছিল রাফেজি। এ রাফেজি লোকটি ছিল সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও ধর্মত্যাগী। কারণ সে নবুয়ত দাবী করেছিল।

কুফাতে এ দুই দলের মধ্যে কোন্দল ও যুদ্ধ লেগে থাকত। হুসাইন বিন আলী (রাঃ) কে আশুরার দিন হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করেছে- জালেম ও বিদ্রোহী দল। আল্লাহ তাআলা হুসাইন (রাঃ) শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। যেমনিভাবে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছিলেন। শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন হামযা (রাঃ), জাফর (রাঃ), তাঁর পিতা আলী (রাঃ) প্রমুখ। এ শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। তিনি ও তাঁর ভাই হাসান (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের নেতা। উচ্চ মর্যাদা পরীক্ষা ছাড়া অর্জন করা যায় না। যেমনটি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ মানুষ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার শিকার হয়? তিনি বললেন: নবীগণ। এরপর নেককার ব্যক্তিগণ। এরপর এদের চেয়ে দ্বীনদারিতে যারা নিম্ন পর্যায়ের তারা। এরপর তাদের চেয়ে দ্বীনদারিতে নিম্ন পর্যায়ে যারা তারা। ব্যক্তির দ্বীনদারির অনুপাতে তাকে পরীক্ষা করা হয়। ব্যক্তির দ্বীনদারি অনেক মজবুত হলে পরীক্ষার তীব্রতা বাড়ানো হয়। দ্বীনদারি হালকা হলে পরীক্ষা সহজ করা হয়। মুমিনকে পরীক্ষায় ফেলতে ফেলতে এক পর্যায়ে মুমিন ভূপৃষ্ঠে হেঁটে বেড়ায় অথচ তার কোন গুনাহ থাকে না।[তিরমিযি ও অন্য গ্রন্থকারগণ হাদিসটি সংকলন করেছেন] হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বেই উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত ছিল। তাঁদের উত্তম পূর্বসূরি যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা তত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হননি। তাঁরা

দু'জনের জন্ম হয়েছিল ইসলামের জয় জয়কার সময়ে। সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে তাঁরা বড় হয়েছেন। মুসলমানেরা তাঁদের দুজনকে শ্রদ্ধা সম্মান করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা যান তখনও তাঁদের পূর্ণ বুঝ হয়নি। তাই তাদের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামত হচ্ছে তিনি তাদেরকেও পরীক্ষায় ফেলেছেন; যাতে তারা তাদের পূর্বসূরিদের কাতারে এসে যেতে পারে। যেভাবে তাদের চেয়ে যিনি উত্তম তাঁকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। আলী (রাঃ) তাদের চেয়ে উত্তম। তাঁকে হত্যা করে শহীদ করা হয়েছে। হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মানুষের মধ্যে বড় ফিতনা ও গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্বে ওসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড উম্মতের বিভক্তিকে আবশ্যকীয় করে তোলে। যার ফলে মানুষ যে বিভক্ত হয়েছে সে বিভক্তি আজো রয়ে গেছে। তাই তো হাদিসে এসেছে- “যে ব্যক্তি তিনি জিনিস থেকে মুক্তি পেয়েছে সে আসলেই মুক্তি পেয়েছে: আমার মৃত্যু, একজন ধৈর্যশীল খলিফার হত্যাকাণ্ড এবং দাজ্জাল।”

এরপর শাইখুল ইসলাম হুসাইন (রাঃ) এর জীবনীর কিছু অংশ ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: “তিনি মারা গিয়ে আল্লাহর রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টিতে স্থান করে নিয়েছেন। অথচ এমন কিছু দল রয়েছে যারা হুসাইন (রাঃ) এর সাথে পত্র আদান প্রদান করে প্রয়োজনের সময় তাঁকে সমর্থন দেয়ার ও সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। তিনি যখন তাদের কাছে তাঁর ভাতিজাকে পাঠালেন তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখেনি। শুধু তাই নয় তারা তাঁর পক্ষ নিয়ে লড়াই করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) এর মত হুসাইন (রাঃ) এর বিচক্ষণ শুভাকাংখীগণ তাঁকে সেসব প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করতে ও তাদের কাছে না যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের নিকট যাওয়াতে কোন কল্যাণ নেই, এর পরিণতি শুভ হবে না। তারা যা বলেছেন সেটাই ঘটেছে। তাকদীর তো আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত। যখন হুসাইন (রাঃ) তাদের কাছে পৌঁছে দেখলেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; তখন তিনি ফেরত চলে যাওয়ার কিংবা কোন সীমান্ত চকিতে আশ্রয় নেয়ার কিংবা তাঁর চাচাত ভাই ইয়াজিদ এর সাথে দেখা করার সুযোগ চাইলেন। কিন্তু তারা বন্দি হিসেবে আত্মসমর্পণ না করলে তাকে কোন সুযোগ দিতে রাজি হল না। এক পর্যায়ে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনিও তাদের বিরুদ্ধে লড়ে গেলেন। অবশেষে তারা তাঁকে ও তাঁর পক্ষের লোকজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে শহিদ করল। আল্লাহ তাআলা এই শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁকে আহলে বাইতের পুতপবিত্র পূর্বসূরিদের সাথে একত্রিত করলেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর সাথে যারা অন্যায় করেছে ও সীমালঙ্ঘন করেছে তাদেরকে অপমানিত অপদস্থ করলেন। এই ঘটনা মানুষের মধ্যে অকল্যাণকে অনিবার্য করে তুলেছে। একদল মানুষ- জাহেল ও জালেমে পরিণত হয়েছে। অপর একদল হয়েছে- নাস্তিক মুনাফিক। অপর একদল হয়েছে- পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত। পথভ্রষ্ট দলটি তাঁর প্রতি ও আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত। তারা আশুরার দিনকে মাতম, দুঃখপ্রকাশ ও ক্রন্দনের দিন হিসেবে গ্রহণ করত। এই দিনে তারা জাহেলি রীতিতে গালে চড় মারা, বুকের আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা ও জাহেলি রীতিতে শোক প্রকাশ করা ইত্যাদি চর্চা করে। অথচ সদ্য ঘটিত বিপদ মুসিবতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ হচ্ছে- ধৈর্য ধারণ করা, বিপদকে সওয়াব অর্জনের মওকা হিসেবে গ্রহণ করা ও ইন্নালিল্লাহ... বলা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَإِذَاأَصَابَتْهُمْمُصِيبَةٌقَالُواإِنَّالِلَّهِوَإِنَّاإِلَيْهِرَاجِعُونَ (156)
أُولَئِكَعَلَيْهِمْصَلَوَاتٌمِنْرَبِّهِمْوَرَحْمَةٌوَأُولَئِكَهُمُالْمُهْتَدُونَ

(অর্থ- তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরে। যারা বিপদে পতিত হলে বলে:ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই সান্নিধ্যে আমরা ফিরে যাবো)। এদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত নাযিল হয় এবং এরা সুপথপ্রেরচিালিত।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫] সহিহ হাদিসে এসেছে- "যে ব্যক্তি গালে চপেটাঘাত করে, বুকের আচ্ছাদন খুলে ফেলে (অসন্তুষ্টি প্রকাশার্থে) ও জাহেলী ডাক চিৎকার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়"। তিনি আরও বলেন: "(বিপদের সময়) ডাক চিৎকার করে ক্রন্দনকারী, মাথা মুণ্ডনকারী ও পোশাক আশাক ছিন্নবিন্নিকারীর সাথে আমার সম্পর্ক নেই"। তিনি আরও বলেন: "যদি বিলাপকারিনী মৃত্যুর আগে তওবা না করে তাহলে কেয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে তার গায়ে থাকবে আলকাতরার পোশাক, শরীরের চামড়া যেন গুটি বসন্তের বর্ম।" মুসনাদে এসেছে-ফাতেমা বিনতে হুসাইন তাঁর পিতা হুসাইন (রাঃ) থেকে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, "যদি কোন ব্যক্তি তার পুরাতন কোন মুসিবতের কথা স্মরণ করে এবং নতুনভাবে আবার ইন্নালিল্লাহ... পড়ে তাহলে মুসিবতের দিন আল্লাহ তাকে যে সওয়াব দিয়েছিলেন আজকেও সে সওয়াব দিবেন।" এটি মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তাই হুসাইন (রাঃ) এর মুসিবত এবং অন্য কারো মুসিবতের কথা স্মরণ হলে মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে- ইন্নালিল্লাহ... পড়া; যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন; যাতে করে বিপদের দিন বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহ যেভাবে সওয়াব দিয়েছেন তাকেও সে সওয়াব দেন। তাই আল্লাহ তাআলা যদি খোদ বিপদের সময় ধৈর্য রাখার ও সওয়াবপ্রাপ্তির নিয়ত করার নির্দেশ দেন তাহলে এতকাল পরে ব্যাপারটা কেমন হতে পারে!এজন্য পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত গোষ্ঠী কর্তৃক আশুরার দিনে মাতম করা, বিলাপ ও ডাক চিৎকার করা, শোকাবহ কাসিদা (কবিতা) পড়া, বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা যেগুলো মিথ্যাতে ভরপুর; আর কিছু সত্য হলেও এতে শোককে চাঙ্গা করা ও গোঁড়ামি বাড়ানো ছাড়া কোন ফায়দা নেই- এসব কিছু শয়তানের প্ররোচনা। এতে করে পারস্পারিক জিঘাংসা বাড়ে, যুদ্ধের উস্কানি দেয়া হয়, ইসলামপন্থীদের মাঝে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়, পূর্ববর্তীদেরকে গালিগালাজ করার পথ খুলে যায়, দুনিয়াতে মিথ্যার ঢাকঢোল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত দলটির মত আর কোন মুসলিম উপদল মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, পারস্পারিক গোলযোগ সৃষ্টি ও কাফেরদের সাথে সহযোগিতা করে না। এরা খারেজিদের চেয়ে জঘন্য; যাদের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তারা মূর্তিপূজকদেরকে বাদ দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করে।" আর এরা আহলে বাইত (নবী পরিবার) ও উম্মতে মুসলিমার বিরুদ্ধে ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদেরকে সাহায্য দিয়েছে। তারা বাগদাদে ও অন্যান্য স্থানে আহলে বাইত তথা আব্বাস (রাঃ) এর বংশধরদের বিরুদ্ধে তুর্কি মূর্তিপূজক ও তাতারি মূর্তিপূজকদেরকে সাহায্য দিয়েছে; যারা হত্যাযজ্ঞ, বন্দি ও ঘরবাড়ী ধ্বংস ইত্যাদির কোন কিছু বাদ রাখেনি। মুসলমানদের উপর এ দলটির ক্ষতি কোন বাগ্মীর পক্ষেও বিবৃত করা সম্ভব নয়। এ দলটির বিপরীতে রয়েছে- আরেক গোষ্ঠী; যারা হয়তবা হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর পরিবারের প্রতি বিদ্বেষী নাসেবি গোষ্ঠী; অথবা তারা মূর্খ জাহেল মানুষ। এরা অন্যায়ের মোকাবিলায় আরেক অন্যায় করে; মিথ্যার মোকাবিলায় মিথ্যা বলে, মন্দের মোকাবিলা করে মন্দ দিয়ে, বিদআতের মোকাবিলা করে বিদআত দিয়ে। আশুরার দিন চোখে সুরমা, চুল-দাঁড়িতে মেহেদি লাগানো, পরিবারের সদস্যদের জন্য

অতিরিক্ত খরচ করা, ভাল খাবারদাবার রান্না করা ইত্যাদি ঈদের সময় যা যা করা হয় সেগুলোর মাধ্যমে আনন্দ স্ফূর্তি প্রকাশ করার সপক্ষে তারা কিছু রেওয়ায়েত বানিয়েছে। এভাবে এ গোষ্ঠী আশুরাকে ঈদ-উৎসবে পরিণত করেছে। আর অপর গোষ্ঠী আশুরাকে মাতম ও শোকাবহ দিবসে পরিণত করেছে। এ দুটি দলই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত; এরা সবাই সুন্নতের বরখেলাপকারী। যদিও রাফেজিদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অতি জঘন্য, তাদের অজ্ঞতা চরম পর্যায়ে, তাদের অন্যায় প্রকাশ্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবার সাথে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমার পরবর্তীতে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে অচিরেই তারা চরম মতানৈক্য দেখবে। সে মুহূর্তে তোমাদের উচিত হবে- আমার আদর্শ ও আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদা (সুপথে পরিচালিত) এর আদর্শ অনুসরণ করা। তোমরা এ আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে, বরং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। আর নবপ্রচলিত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকবে। কারণ প্রত্যেক অভিনব বিষয় বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই বিভ্রান্তি।” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তাঁর পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার কেউ আশুরার দিন এসব কিছু, শোকাবহ আচার অনুষ্ঠান কিংবা আনন্দব্যঞ্জক অনুষ্ঠান কোনটি চালু করেননি। তবে “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনা এলেন তখন দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এর হেতু কি? তারা বলল: এদিন আল্লাহ মুসা (আঃ) কে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন; তাই আমরা রোজা রাখি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মূসা (আঃ) এর প্রতি আমাদের অধিকার তোমাদের চেয়ে বেশি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন রোজা রাখলেন এবং রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।” জাহেলি যুগে কুরাইশরাও এই দিনকে সম্মান করত।

আশুরার রোজা রাখার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে নির্দেশ এসেছে সেটা শুধু ঐ বছরের সে দিনটি রোজা রাখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কারণ তিনি মদিনায় এসেছিলেন রবিউল আউয়াল মাসে। পরবর্তী বছর তিনি নিজে আশুরার রোজা রাখলেন ও সাহাবীগণকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। এরপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয় এবং রমজানের রোজার বিধান আশুরার রোজার বিধানকে রহিত করে দেয়। সে নির্দেশের ভিত্তিতে সে দিনের রোজা রাখা কি ফরজ ছিল নাকি মুস্তাহাব ছিল- এ বিষয়ে আলেমগণ দ্বিমত করেন। তবে সর্বাধিক শুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- সেদিনের রোজা রাখা ফরজ ছিল। পরবর্তীতে যারা এই দিন রোজা রাখতেন তারা মুস্তাহাব হিসেবে রাখতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিনে সর্ব সাধারণকে রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন না; বরং বলতেন, “আজ আশুরার দিন। আমি রোজা রেখেছি। তোমরা যারা রোজা রাখতে চাও রোজা রাখতে পার।” তিনি আরও বলতেন: “আশুরার দিনের রোজা বিগত এক বছরের গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়। আর আরাফার দিবসের রোজা বিগত ও আগত দুই বছরের গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়।”

“তাঁর শেষ জীবনে যখন তাঁকে জানানো হল যে, ইহুদিরা এই দিনকে উৎসব দিবস হিসেবে গ্রহণ করে তখন তিনি অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বললেন: যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে ৯ তারিখেও রোজা রাখব” যাতে ইহুদিদের বরখেলাপ করতে পারেন এবং তাদের ঈদ-উৎসব পালনের সাথে সাদৃশ্য হয়ে না যায়। সাহাবায়ে কেরাম ও আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ এই দিন রোজা রাখতেন না এবং রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলতেন না। বরং এককভাবে এই দিন রোজা রাখাকে মাকরুহ বলেন। এমন মতামত

কুফার একদল আলেম থেকে বর্ণিত আছে। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ এই দিন রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলেন। সঠিক মত হচ্ছে- যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোজা রেখেছে তার জন্য ৯ তারিখেও রোজা রাখা মুস্তাহাব। কারণ এটাই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ নির্দেশ। কারণ হাদিসের কোন কোন সূত্রে তাঁর কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে "যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে ১০ তারিখের সাথে ৯ তারিখেও রোজা রাখব"। অতএব, জানা গেল শুধু রোজা রাখার আমলটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জারী করেছেন। এ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে যেমন- দানাদার কিংবা দানাহীন বিশেষ খাবার তৈরী, নতুন পোশাক পরিধান করা, অতিরিক্ত খরচ করা, সারা বছরের বাজার সেদিন করে রাখা, বিশেষ কোন ইবাদত পালন করা; (যেমন বিশেষ নামায, পশু জবাই, সেই দিন রান্না করার জন্য কোরবানীর গোশত সংরক্ষণ করে রাখা), সুরমা লাগানো, মেহেদি লাগানো, গোসল করা, মুসাফাহা করা, পারস্পারিক দেখা সাক্ষাত করা, বিশেষ কোন মসজিদ বা মসজিদসমূহ যিয়ারত করতে যাওয়া ইত্যাদি সব গর্হিত বিদআত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তাঁর খলিফাবর্গের কেউ এর কোনটি জারী করেননি; এমনকি মুসলিম আলেমগণের কেউ এ কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলেননি। যেমন- ইমাম মালেক, ইমাম ছাওরি, ইমাম লাইছ বিন সাদ, আবু হানিফা, আওযায়ি, শাফেয়ি, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহুইয়া প্রমুখের মত কোন ইমাম বা আলেম এ কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলেননি।

দ্বীন ইসলাম মূলতঃ দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক: আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। দুই: আমরা আল্লাহর বিধান মোতাবেক তাঁর ইবাদত করব; বিদআত মোতাবেক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের (প্রতিপালকের) সাক্ষাত কামনা করে, সে যেনআমলে সালেহ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে"[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আমলে সালেহ হচ্ছে- যে আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন, পছন্দ করেন; সেটাই শরিয়ত ও সুন্নাহ। তাইতো উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তাঁর দুআতে বলতেন: "হে আল্লাহ, আমার সকল আমল যেন সালেহ (সুন্নাহ মোতাবেক) হয়, আপনার জন্য খালেস (একনিষ্ঠ) হয় এবং এতে যেন অন্য কারো অংশ না থাকে।[ইবনে তাইমিয়ার কথা থেকে সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত; আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]

আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।